OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 385 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 385 - 394
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুধ্যানে আরণ্যক : প্রকৃতি ও অরণ্যচারী মানুষ

ড. মনোয়ার আলী
শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়
Email ID : monowaralimail@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Nature, Extraordinary, Night, Beauty, Fullmoon, Strange, Mysterious, Forest, Environment, Village.

Abstract

In Bibhutibhushan Bandyopadhyay novel Aranyak nature and men are standing side by side. If the hero of this novel Satyacharan, then the heroine must be nature. The extraordinary description of day and night there against the background of secluded nature surely fascinated the reader. Although the author himself describes that the beauty of fullmoon night in forest cannot be described in pen and few words. Must be seen to enjoy. The picture of an extraordinary beauty of nature has been thoroughly described by the author in every chapter of Aranyak novel. Bibhutibhushan's nature consciousness is so deep that while describing him form, he has developed the forest as a living human form. He realised that this is not the world, this is the Dreamland that I knew so far, this horizon-wide astrological beings come here let at night. We find such a description in most of Bibhutibhushan's works. In the beautiful green sea we saw a floating sailor Satyacharan. On the one hand, Nada Boihara on the other hand, the impression of Mohanpura forest is in the novel detailed up to the vague blue boundary line.

In the novel I Arañyak, the characters of aranyachari are introduced to the narrator through simple yet strange mysterious each one like nature. Aranyachari Dhawtal Sahu is as simple and innocent as the forest or nature. The people of Bibhutibhushan in the novel Aranyak come from the simple environment of the village. And his natural sympathy towards them is a little more prejúdiced then that of the educated gentry of the city. These ordinary people have become an invitable part of the forest. Dhawtal Sahu, Raju pade, Ganu Mahato, Ganori, Jugal Prasad, Dobru Panna, Bhanumati are half forest and half human. The secret of their words is like the language of the forest. Out of the forest Kunta, Manchi, Dhaturia, Matuknath pade, Rajput, Ras bihari Singh is character is glowing with self-glory. The vastness of nature deeply affects the human mind, benevolent. So it can be said that in this novel nature and forest people Compliment each other.

Discussion

বাংলা উপন্যাসের জগতে অরণ্যকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা খুব কম নয়। মনোজ বসুর লেখা 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত', সমরেশ বসুর লেখা 'দুই অরণ্য', মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'অরণ্যের অধিকার', বুদ্ধদেব গুহ'র লেখা 'পারিধী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আরণ্যক' ইত্যাদি। বাংলা উপন্যাসে অরণ্যকে তার প্রসার, গভীরতা ও তার অস্তিত্বকে মনে প্রাণে ধরে রেখেছেন অরণ্য উপাসক ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কর্মসূত্রে অরণ্যের খুব কাছাকাছি আসেন এবং এই অরণ্যই ঔপন্যাসিকের জীবন সম্পন্ন রূপে বদলে দেয়। বিভূতিভূষণ ১৯২৩ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাথুরিয়াঘাটার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এর জমিদারের কর্মী হিসেবে বিভিন্ন পদে নানা সময়ে নিযুক্ত থেকেছেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজে ভাগলপুরে যোগদান এবং সেখানকার কাছারি বাড়িতে থাকতেন; — যেটা ভাগলপুরের 'বড়বাসা' বলে পরিচিত ছিল। সেখানকার স্থানীয় ভাষায় বলা হত 'বড়িবাসা'। এই বাড়ির দোতালায় থাকতেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিই প্রকৃতি কেন্দ্রিক।

প্রকৃতি অবশ্যই সাহিত্যের আনুষঙ্গী বিষয়। সবধরনের সাহিত্যেই প্রকৃতির চিত্র নানাভাবে উঠে আসে। কালিদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ এবং অবশ্যই পাশ্চাত্য সাহিত্যে শেলী, কিটস, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সৃষ্টিতে প্রকৃতি নানা ভাবে ধরা দেয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতির অপূর্ব চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। কলকাতা শহর থেকে দূরে ভাগলপুর, পূর্ণিয়ার প্রকৃতির অপূর্ব সান্নিধ্য ও আত্মমগ্নতা ঔপন্যাসিকের মন এখানে ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। ঔপন্যাসিক 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রস্তাবনায় প্রকৃতির রূপ বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন —

> "কলিকাতা শহরের হৈ চৈ কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধূধূ ঝাউবন আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়হীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাত্রে বন্য নীল-গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খর রৌদ্র মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুন্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙ্গিন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্ত পলাশের ঘন অরণ্যের কথাভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোন অবসর দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্য ভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।"[১]

একদিকে লবটুলিয়া বইহার, নাঢ়া বইহার এর বিরাট অরণ্যানী, সরস্বতী কুন্ডির স্নিগ্ধ জলরাশিও তার মনোমুগ্ধকর বনভূমি, অন্যদিকে মোহনপুরা বিরাট ফরেস্টের বিশাল ধূসর সীমারেখা, কুশি নদী, সাঁওতাল রাজ্যের ধনঝরি পাহাড়ের শৈলশ্রেণি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসপটে প্রভাব ফেলেছিল তারই প্রকাশ পেয়েছিল 'আরণ্যক' উপন্যাসটি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> "বিশাল অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রহস্যময় যোগাযোগের নিবিড় অনুভূতি বিভূতিভূষণ এর এক প্রকার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেই রহস্যময়তা অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করেছে আরণ্যকে।"[২]

এই অরণ্য সংকুল বিস্তীর্ণ ধরিত্রী তো নিতান্ত কল্প নয়। ভাগলপুরের গঙ্গা অতিক্রম করে নৌগাছিয়া, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, গয়া পর্যন্ত বিস্তারিত। সত্যি, সত্যি বিভূতিভূষণ-এর প্রকৃতিপ্রেমিক অকৃত্রিম; — কল্পনার অতীত। তাঁর সৃষ্টিতে দেখা যায় আটকামানের প্রকৃতি যেমন স্বয়ং আলাদা, তেমনি নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া, আজমাবাদেরও প্রকৃতির স্বাদও ভিন্ন ধরনের। নির্জন পটভূমিতে যেখানে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে দিনের পর আসে রাত। এখানে সেই দিন এবং রাতের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। এই অসাধারণ চিত্র বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখা মানুষের কাছে তা কোনো মতোই দেখা দেয় না। তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য লেখকদের মতো কোনো 'ইজম' এর ধার না ধেরে নিজের জীবন দর্শনের দোয়াতে কলম ডুবিয়ে এই জগতের মধ্যে যে প্রকৃতির অপূর্ব চিত্র, যে অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের রচনা করলেন, পাঠক সমাজের কাছে আজও সমান বিভায় বেঁচে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও বলা যায়, অন্যান্য লেখকরা যেখানে প্রকৃতির বিশুদ্ধ সৌন্দর্যলোকে উত্তরণের জন্য প্রাত্যহিকতার দায়বন্ধন এড়াতে সর্বদা ব্যস্ত, সেখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমস্ত দায় অঙ্গীকার করে মনে প্রাণে প্রকৃতিকে লক্ষ করেছেন — তার অনন্ত সৌন্দর্য, তার বীভৎতার সবরকমের পরিপ্রেক্ষিতে।

তারই ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় আরণ্যকের মতো উপন্যাসের; — যা সৌন্দর্যবোধের নতুন পরিচয় উদ্ভাসিত করে পাঠকের অন্তরে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

> “দৃশ্যের পর দৃশ্য একদিকে বর্নপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যের চক্ষু ও মনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তায় রূপাতীত ধ্যান তন্ময়তায় মগ্ন করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে ত নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।”[৩]

বিভূতিভূষণের আরণ্যকের মতো সৃষ্টি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়, ইউরোপীয় সাহিত্যেও সত্যিই পাওয়া যায় না। লেখকের মন মানস সর্বদা প্রকৃতি প্রেমে আবদ্ধ তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে আরণ্যক উপন্যাসের প্রতিটি পরতে পরতে। যদিও এটাও উপন্যাস তবুও এখানে কোনো ধারাবাহিক কাহিনী নেই। এ প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

> “আরণ্যক উপন্যাসে সুদীর্ঘ কোন কাহিনী বা উপকাহিনী নেই।”[৪]

বলা যেতে পারে ঔপন্যাসিকের মনোজগতের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বাণীটির সঙ্গে আধ্যাত্ম মিলন ঘটেছে। আর লেখক তার মাঝে মাঝে সমাজের অন্ত্যজ মানুষের প্রতিদিনের সুখ দুঃখের, হাসি কান্নার টুকরো টুকরো ছবির প্রতিফলন অঙ্কন করেছেন। হাজার হাজার বিঘা ঘন অরণ্যের পটভূমিতে লেখা আরণ্যক উপন্যাসে কোনো নায়ক নেই। তবে এখানে নায়িকা স্বয়ং প্রকৃতি। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটি ম্যানেজার সত্যচণেরর জবানিতে উত্তম পুরুষে রচিত। কলকাতার যুবক সত্যচরণের শহুরে মন মানসিকতা ভাগলপুরের এই বিশাল বিস্তীর্ণ অরণ্য দর্শন করে প্রথমদিকে বিরক্ত ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পরে যত দিন যায় ক্রমশ সত্যচরণের এই মন প্রকৃতির সম্মোহনি শক্তির টানে ধীরে ধীরে যেন সেখানে বাধা পড়ে যায়।

সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন —

> “বিভূতিভূষণকে সাধারণভাবে প্রকৃতির শিল্পী বলে অভিহিত করা হয়। ঈশ্বর, প্রকৃতি মানুষ— এই তিন নিয়েই তাঁর শিল্পলোক এবং সে ক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃতির অধীন: এভাবেই তাঁকে দেখা হয়। এবং তাঁকে তিনি শান্ত গ্রাম বাংলার নিসর্গ প্রেমী বলে বর্ণনা করা হয় সেখানে তিনি মুখ্যত পথের পাঁচালী লেখক। অথচ তিনি যে ভয়াল নিষ্ঠুর মানুষের সুখ দুঃখ সম্পর্কে উদাসীন প্রকৃতিরও শিল্পী, তা সবসময় মনে রাখিনা। আরণ্যক উপন্যাস তার প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল।”[৫]

‘আরণ্যক’ উপন্যাসের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির অপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছেন বারবার। দিগন্ত বিস্তৃত লবটুলিয়ার অরণ্যের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, ফুলুকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নার অর্ধ রাত্রির মায়াময় পরিবেশ, সরস্বতী কুন্ডীর ঘন পুষ্পপল্লবী আর পাখির কিচিরমিচির শব্দ যেন এক অপূর্ব ও ইন্দ্রজালিকের রচনা করেছে। সর্বদা সত্যচরণের মনে হতো এটি পরীরাজ্য, পরীদের আস্তানা। কখনো ঘোড়া নিয়ে ছুটতো মিশর নির্জন, নি:শব্দ রাত্রিতে সত্যচরণ। দুই দিকে ঘন অরণ্য। তার উপরে চন্দ্রতাপ বিছানো। সেই আলোকে লক্ষ করছে নীলগাই ও হায়েনার বাচ্চারা কুন্ডীর জলে মুখ ডুবিয়ে জল পান করছে। আবার কোনো কোনো দিন সত্যচরণ সরস্বতী কুন্ডির নদীর ধারে বিস্তীর্ণ তরুতলে শান্তভাবে শুয়ে পৃথিবীকে বার বার অবলোকন করেছে। এই কুন্ডীর প্রায় তিনটি দিক ঘন অরণ্যে মোড়া আর যেদিকে কিছুটা ফাঁকা সেদিকে নীল আকাশ বহুদূর প্রসারিত এবং কিছুটা দূরে আপছা শৈলমালা বনপ্রেমিক সত্যচরণের মনকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে দিক দিগন্তে কোনো এক স্বপ্ন রাজ্যে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরণ্যক উপন্যাসের প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

> “জনহীন, বিশাল অরণ্য প্রান্তরের জ্যোৎস্না রাত্রি তাঁহার কল্পনাকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে— ইহা কখনও পরীরাজ্যের মায়াময়, অপার্থিব স্বপ্নসৌন্দর্য কখনও বা প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগাইয়াছে।তেমনি নিস্তব্ধ অন্ধকার নিশীথিনী এক গভীরতর রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে— যাহাকে বলে Cosmic imagination তাহাকেই— স্ফুরিত করিয়াছে; কল্পনাকে সৃষ্টি রহস্যের মর্মস্থলে লইয়া গিয়া সৃষ্টি ক্রিয়ার নিগূঢ় আনন্দ শিহরণ ও সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি পরিচয়কে উদঘাটিত করিয়াছে।”[৬]

সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> “প্রাকৃতিক এবং অতিপ্রাকৃত জীবনের ভেদরেখা যে অরণ্যভূমিতে মিলেমিশে রয়েছে সেখানকার বর্ণনাভঙ্গিতে গদ্যের ঋজুতার সঙ্গে কাব্যের নমনীয়তা প্রয়োজন।”[৭]

বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায় অশরীরী বেশে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় বোমাইবুরুর জঙ্গলে। এই প্রথম বহুব্যাপ্ত নির্জন বনভূমিতে বহির্জগতের সম্মুখীন হয়েছে। এই অনধিকার প্রবেশে সে খানিকটা রুষ্টা। তার কারণ এরা সতর্ক নিষেধবাণী অনেক সময় উপেক্ষা করেছে। কলকাতার শিক্ষিত ম্যানেজার সত্যচরণ এইসব অলৌকিক ব্যাখ্যায় কখনোই মনে প্রানে বিশ্বাস করেন না। রামচন্দ্র আমিনের ছেলে অনেক রাত এক অসম্ভব দৃশ্য দেখে শেষমেষে দুলঙ্ঘ্য নিয়তির হাতছানিতে ঘর থেকে বেরিয়ে মারা গেছে। সত্যচরণ সেখানে গিয়ে দেখলেন —

> “তাহারা যে ঘরটাতে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়ে। মুখে তার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন কি একটা বিভীষিকা দেখে আঁৎকিয়ে যেন মারা গেছে।”[৮]

সত্যচরণকে এই ঘটনা ভাবতে বাধ্য করায়। এইসব জনহীন অরণ্য ও ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যায় সত্যচরণ। চাঁদ সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে রাতের প্রকৃতির তেমন কোনো মিল নেই এখানে। শীতকালের ছোটোদিনে এই অরণ্যের মধ্যে চতুর্দিকে যেন শূন্যতা। এখানকার মানুষের মতো প্রকৃতি ও খানিক শূন্যতাবোধে আক্রান্ত। চারদিকে খোলা প্রান্তর, বনফুল ও কেঁয়োঝাঁকার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে সত্যচরণ ভাবেন —

> “যে কথাটা বারবার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন মতেই ঠিকমতো বুঝাইতে পারতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্য, বিরাটত্বের ভয়াল গা ছম-ছম করানো সৌন্দর্যের দিকটা।”[৯]

এই বনপ্রান্তরের বিরল সৌন্দর্য বিভূতিভূষণের সৃষ্টি যেন কোলরিজের কবিতার প্রকৃতি চেতনার কথাকে বারবার স্মরণ করায়।

লেখকের প্রকৃতিচেতনা ঠিক গতানুগতিক পথে পাওয়া যায় না। কেননা তাঁর মরমি সত্তা; — যা প্রজ্ঞার চেয়েও অনুভববেদ্য। বাস্তবের মাটিতে পা রেখেও রোমান্টিকমন যার মধ্যে সর্বদা বিরাজ করে। আর এই রোমান্টিকতার জন্যেই জগৎ-জীবন-প্রকৃতি হয় আলোকিত। কারো নদীতে যাওয়ার আগেই সত্যচরণের মনে হয় — এই মুক্ত জ্যোৎস্না শুভ্র বন প্রান্তর সবাইকে আকর্ষণ করে না। যারা বারমখা-খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষ সে তাদেরকেই কাছে ডাকে। সেই সময় অরণ্যে জেগে ওঠে এক নবলোক। মনে হয় —

> “এ সে পৃথিবী নয়, এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে। তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু। বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনেনা, দিগ্বলয় রেখা যাদের কখনো হাতছানি দিয়া ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোনো কালেই।”[১০]

কিন্তু লেখকের এই প্রকৃতির নানা রূপ বারে বারে ধরা পড়েছে। সত্যচরণ প্রকৃতির অরণ্য দেখে মোহিত হয়ে তার মনে হয়েছে –

> “যতদূর দৃষ্টি চলে, এদিকে নাঢ়া-বইহার ওদিকে মোহনপুরা অরণ্যের অস্পষ্টনীল সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ করিতেছে। এই সবুজের সমুদ্রবর্ষা সচল হাওয়ায় মেঘকজ্জ্ব আকাশের নিচে এই দীর্ঘ মরকত শ্যাম তৃণভূমির মাথায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। আমি যেন একা এ অকূল সমুদ্রের নাবিক কোনো রহস্যময় স্বপ্ন বন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছি।”[১১]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

> “প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসে গৌরব তাহা এই উপন্যাসের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। সীমাহীন অরণ্য প্রকৃতি লেখকের মন ও কল্পনাকে পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে।”[১২]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকে প্রকৃতির যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে লেখক কারো দ্বারা প্রভাবিত হননি বরং বলা যায় অন্যকে প্রভাবিত করেছেন। এই উপন্যাসের নরনারীর একান্ত আশ্রয় হিসেবে অবস্থান করে প্রকৃতি অর্থাৎ যারা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাই আরণ্যকে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন মানুষের থেকেও প্রকৃতির স্থান অনেক উপরে। সত্যচরণ যে প্রকৃতি উপাসনা করেন তার সঙ্গে মিলে আছে গভীর আধ্যাত্মবোধ। সত্যচরণ মনে মনে দুঃখিত হন এই রম্যভূমিতে যারা বাস করেন সেইসব অরসিকদের জন্য তিনি বলেন —

> “এখানকার মানুষে গাছপালার সৌন্দর্য বোঝে না, রম্যভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মত পেটে খাইয়া জীবনযাপন করিতে। অন্য দেশ হইলে আইন করিয়া এমন সব স্থান সৌন্দর্য পিপাসু প্রকৃত রসিক নর নারীর জন্য সুরক্ষিত করিয়া রাখিত...।”[১৩]

সত্যচরণের আধ্যাত্মজগৎ একটু অন্য ধরনের। তিনি ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই তাকে খুঁজে পান। লেখক এর মিষ্টিক চেতনা প্রকৃতি অবলম্বনে নবরূপ লাভ করেছে আরণ্যক উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক বলেছেন —

> “কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্ত মেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবারণী সুর সুন্দরীর সাজে হিম স্নিগ্ধ কুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশ ভরা তারার মালা গলায় অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।”[১৪]

সত্যচরণ প্রকৃতির অনন্ত অসীম প্রেক্ষাপটে নিজের মনের কথার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে —

> “ফুলকিয়ার সেই জ্যোৎস্না রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যালোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া উপলব্ধি করা যাইবে না... জীবনে একবারও সেই জ্যোৎস্না রাত্রি দেখা উচিত, যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির অপরিচিত রহিয়া গেল।”[১৫]

প্রকৃতির পাশাপাশি ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে যত্রতত্র অরণ্যচারী মানুষের বাস। এই মানুষরা হলেন কুন্তা, নন্দলাল ওঝা, ধাঁওতাল সাহু, গণু মাহাতো, গিরিধারী লাল, রাজু পাঁড়ে, ধাতুরিয়া, রাসবিহারী সিংহ, ছোটু সিং, যুগলপ্রসাদ, মোটুকনাথ পাঁড়ে, বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, দোবরু পান্না, ভানুমতী, মঞ্চী, নকছেদী ভগৎ, সুরতিয়া ত্রা যেন অর্ধেক অরণ্য, অর্ধেক মানুষ। এদের কথার রহস্য যেন অরণ্যেরই ভাষা। এরা প্রকৃতির উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। তবে এই সাধারণ স্থানীয় দেহাতী মানুষ, রাজপুত মহাজন, সাঁওতাল রাজা ও তার নাতনী উপন্যাসের কাহিনীতে যেমন মূল্য পেয়েছে, তেমনি অতি মানবীয় গুণে তাদেরকে সাধারণের ধোঁয়াছোঁয়ার বাইরেও রাখেননি ঔপন্যাসিক। প্রকৃতির বিশালতা মানুষের মনকে উদার করে, তাদেরকে প্রভাবিত করে। কলকাতা শহরে মানুষ যেখানে ডাল ভাত মাছ মাংস ছাড়া নিজের জীবনের একটা দিনও ভাবতে পারেনা সেখানে লেখক অরণ্যচারী মানুষের জীবন অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছেন যে বছরের পর বছর মানুষ কীভাবে কেবলমাত্র চীনা ঘাসের দানা খেয়ে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছে।

‘আরণ্যক’ উপন্যাসে দেখা যায় যে সভ্য শহুরে সমাজের মানুষ একটু আয়েই নিজের জীবনকে কাটাতে চায় আরাম ও আয়েশের সঙ্গে। সেখানে দেখা যায় ধাওতাল সাহুর মতো চরিত্র যে অরণ্যের মধ্যে নিজের জীবন কাটাচ্ছে কেবলমাত্র কলাইয়ের ছাতু খেয়ে। অথচ সে এলাকার একজন লক্ষপতি মানুষ। এই ধাওতাল সাহু কত টাকা মানুষকে ধার দিয়ে তা আদায়ের জন্য কোন তাগাদা করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেন —

> “টাকা ধার দিয়া সে জোর করিয়া কখনো তাগাদা করিতে পারে না। কত লোক যে তাহার টাকা ফাঁকি দিয়াছে।”[১৬]

সত্যচরণের মতে, তার মহাজন বৃত্তি করা একেবারেই ঠিক না। তার কারণ ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাবে না না জেনেও মোট মোটা সুদের আশায় সমাজের অসৎ লোকদের টাকা দেয়। সবসময় এই অদ্ভুত মানুষটি উড়নিতে বেঁধে রাখে পুরনো সব দলিলপত্র। এইসব কাগজপত্রগুলো সে সত্যচরণকে দেখায় এবং সেই সঙ্গে সতচরণ তাকে বোঝাতে চায় কঠিন মানুষ

না হলে মহাজনবৃত্তি করা যায় না। এই সৎ মানুষটি জীবনে খুবই কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করেছে। তাই সে সত্যচরণকে জানায় —

> “রাঁইচি আর রেড়ি বীজ বিক্রি করে টাকা করেছিলাম হুজুর, নয়তো আমার পৈত্রিক আমলের একটা ঘষা পয়সাও ছিল না। আমি করেছি আবার আমিই লোকসান দিচ্ছি।”[১৭]

এই ধাওতাল সাহুর কাছে একবার সত্যচরণ নিজে টাকা ধার চেয়েছিল। দশ হাজার টাকার রেভিনিউ দাখিলের জন্য তহশীলদার বনোয়ারী লালের পরামর্শে সে টাকা চায়। তার বাড়িঘর ও সাদামাটা জীবনযাপন দেখে সত্যচরণ অবাক হয়ে বলে —

> “বাড়িঘর আসবাবপত্র দেখিয়া কে বলিবে ইহা লক্ষপতি মহাজনের বাড়ি।”[১৮]

অরণ্যচারী মানুষদের মধ্যে মঞ্চী বিভূতিভূষণের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। ফুলয়ারকির আবাদি জমির ফসল কাটার আগত কাটুনি মজুরের বুড়ো নকছেদী ভগৎ এর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সে। তার বয়স চব্বিশ পঁচিশ, স্বাস্থ্যবতী, গায়ের রং কালো, নিটোল গড়নের মেয়েটি। সত্যচরণ তারই কাছে শোনেন তাদের জীবন যাত্রার কাহিনি। তারা বাঘকে ভয় করে না, বড় বড় জীবজন্তু দেখে ভয় পায় না। ধানের সময় বুনো হাতির উপদ্রব বাড়ে। সে জানায় —

> “সে আমরা অখিল কুড়া পাহাড়ে নিচে ছিলাম। একদিন রাতে এক খুপরীর বাইরে রান্না করছি। চেয়ে দেখি পঞ্চাশ হাত দূরে চার-পাঁচটা বুনো হাতি কালো পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে অন্ধকারে— যেন আমাদের খুপরির দিকেই আসছে। আমি ছোট ছেলেটাকে বুকে নিয়ে বড় মেয়েটাকে হাত ধরে রান্না ফেলে খুপরির মধ্যে তাদের রেখে এলাম।”[১৯]

সে দক্ষিণ বিহারের দেহাতি ‘ছিকাছিনি’ ভাষায় সুন্দর কথা বলতে পারে। আমোদ আহলাদ ভালোবাসে সে, সঙ্গে ভীষণ শৌখিন মেজাজের মানুষ। কিন্তু দারিদ্র্য জীবন তার শখ পূরণে অনেকটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিরান্নব্বই বছরের বৃদ্ধ সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না আজ যার রাজত্বের চিহ্নমাত্র নেই। দারিদ্রই তার নিত্য সঙ্গী। এই সাঁওতাল রাজাকে দেখে সত্যচরণ মনে মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। দোবরু পান্নার নাতির মেয়ে ভানুমতীর গায়ের রং কালো, তার অপূর্ব শরীরের গড়ন ও মুখ দেখে সত্যচরণের মনে হয়েছে —

> “এদেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরন্যানি, মেঘমালা শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কচহীন সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক।”[২০]

দোবরু পান্না বহির্জগতের কোন খবর রাখেন না। এই অরণ্যই তার পৃথিবী। শিকার করা ও গোচারণই এই রাজ পরিবারের একমাত্র বৃত্তি। তবুও রাজাকে তার প্রজারা শ্রদ্ধা করে। বিচারের জন্য তারই দ্বারস্থ হয় তারা। বয়স হলেও অটুট তার মনোবল ও দৈহিক শক্তি। ভানুমতী বিভূতিভূষণের আর একটি উজ্জ্বল সৃষ্টি। এই মেয়েটির ব্যবহার ঠিক যেন অরণ্যভূমির স্বাভাবিক জল বাতাসের মতো বলে মনে হয়েছে সত্যচরণের। তার মনে এই কন্যার ব্যবহার সত্যচরণকে মনে প্রাণে আকর্ষণ করেছিল। ভানুমতী তার পিতামহের নির্দেশেই যথার্থ আতিথ্য করেছিল সত্যচরণের। তার সম্পর্কে সত্যচরণের মনে হয়েছে —

> “ভানুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ সরল, মর্যাদা জ্ঞান।”[২১]

দোবরু পান্নার মৃত্যুর পর ভানুমতী সত্যচরণকে তার সমাধি দেখাতে নিয়ে যায় পাহাড়ের উপরে। সেখানে যাওয়ার বিশেষ কারণ দোবরু পান্নার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই। সত্যচরণকে ভানুমতীর সহজ সরল ব্যবহার ও নির্মল ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ করে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

> “দোবরু পান্না অরণ্যভূমির আত্মা, আরণ্যক উপন্যাসেরও আত্মা। ভানুমতী অরণ্যভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক।দোবরু পান্না মর্যাদার প্রতীক। লেখক সৌন্দর্যের মর্যাদা এবং মর্যাদার সৌন্দর্য উভয়কেই নিঃসংকোচে রূপায়িত করেছেন।”[২২]

আজমাবাদের কাছারির মুহুরী যুগলপ্রসাদ সেন বিভূতিভূষণের এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। কিসের টানে মুহুরীর সমস্ত কাজ ফেলে বহুদূর সরস্বতী কুণ্ডীর বন্যপ্রকৃতিকে যুগলপ্রসাদ সাজিয়ে দিতে ছুটে আসে। বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা ধরনের ফুল, লতার বীজ এনে সে বনে পাহাড়ে লাগায়। সেই বীজ থেকে যখন গাছ হয়, ফুল হয় অনায়াসে লতার ঝাঁক বেড়ে ওঠে তখন এইসব দেখে যুগলপ্রসাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। অরণ্য প্রকৃতিকে গাছ দিয়ে সাজালেই তার আনন্দ। একদিকে মানুষ যখন নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বনের পর বন কেটে ফেলেছে অন্যদিকে বিভূতিভূষণের সৃষ্টি এই ব্যতিক্রমী চরিত্র যুগলপ্রসাদ বনের মধ্যে আরও নতুন নতুন বীজ বপন করে তার সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টা করেছে। যেন সাধারণ মানুষ থেকে তিনি বিপরীতধর্মী সত্তা। আরণ্যক উপন্যাসের কথক সত্যচরণ ক্রমশ অরণ্যবাসীর জীবনধারণ সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হয়ে যান। এখানকার মানুষের দারিদ্রতা দেখে তিনি বলেছিলেন —

> “শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরীব। এত গরীব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইলো।”[২৩]

কথকের এই মায়া ও বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কুন্তার কথা শুনে। কুন্তা হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে প্রতিরাতে অন্ধকারে পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতো কেবল ম্যানেজার বাবুর পাতের এটোঁ ভাত নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর ক্রমে যখন কুন্তার পরিচয় সত্যচরণ জানতে পেরেছেন তখন আরও অবাক হয়ে গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ধনী রাজপুত মহাজন দেবী সিংহ কাশী গিয়ে বাইজী কন্যা কুন্তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে আসেন এবং বিয়ে করেন। কিন্তু রাজপুত সমাজের অন্যান্য লোকেরা মনে প্রাণে তাকে কোনোদিনও মেনে নিতে পারেনি। তাই দেবী সিংহের মৃত্যুর পর যে কুন্তা —

> “লবটুলিয়া থেকে কিংখারের ঝালর দেওয়া পালকী চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেতো, বিকানের মিদুরী খেয়ে জল খেতো – আজও ওর এই দুর্দশা।”[২৪]

যদিও লবটুলিয়ার সর্বস্তরের মানুষ কুন্তাকে ঘৃণার চোখে দেখে তবুও কুন্তা নিজের আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রেখে যেন দেবীসিংহের প্রেমের স্মৃতিকে আশ্রয় করেই বেঁচে আছে নিজের মতো। সেই অরণ্য সমাজের মধ্যেই মানুষ জাতিভেদের সংকীর্ণতা নিয়ে যখন নিজেদের সর্বদা ব্যস্ত রেখেছে লেখক এই কুন্তাকে যেন সেই সমাজের এক স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবেই সৃষ্টি করে তুলেছেন। তাই দীর্ঘদিনের পরেই কথক সত্যচরণ কুন্তাকে মনে রেখেছে।

‘আরণ্যক’ উপন্যাসে লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা শ্রেণির মানুষকে দেখিয়েছেন। নকছেদী ভগৎ চরিত্রটি এক যাযাবর শ্রেণির মানুষ, যাকে অরণ্যের ম্যানেজার সত্যচারণ নাঢ়া বইহারের প্রজা হিসেবে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছিলেন। সত্যচরণ নকছেদীর সম্পর্কে বলেছেন —

> “নকছেদী প্রথমে জঙ্গল দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, বলিল হুজুর দিন মানে বাঘে খেয়ে ফেলে দেবে ওখানে— বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘর করি।”[২৫]

নকছেদী ভগতের স্ত্রী ছিল দুটি। একজন তুলসী অপরজন মঞ্চী। আসলে এই মঞ্চী তার মেয়ের বয়সী ছিল। তাই অনেক সময় মঞ্চীর বিভিন্ন ধরনের অন্যায় আবদারও নকছেদীকে মেটাতে হত। অসমবয়সী সম্পর্ক হলেও মঞ্চীর প্রতি নকছেদীর বর্বরতা প্রকাশ পায়নি কোনদিনও। তবে নকছেদী অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন অরণ্যচারী মানুষ ছিলেন। তাই তারই জেদের কারণে মঞ্চীর ছেলে বসন্ত রোগের টিকা না পেয়ে মারা গিয়েছিল এবং সম্ভবত সে কারণেই মঞ্চী তাকে ছেড়ে চলে যায়। পরবর্তীতে সন্তানের প্রতি নকছেদীর উদ্বেগ প্রকাশ পেলেও সত্যচরণ তাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি মঞ্চীর চলে যাওয়ার কারণেই। অরণ্যচারী মানুষদের মধ্যে সুরতিয়া আর একটি অন্যতম চরিত্র। নকছেদী ভগতের মেয়ে সুরতিয়া। লেখক যাযাবর পরিবারের এক উপযুক্ত কন্যা হিসেবে সুরতিয়াকে উপস্থাপিত করেছেন। সুরতিয়া নকছেদীর মেয়ে হলেও সে নকছেদীর মতো বিবেকহীন নয়। মঞ্চী ও তার বয়সের পার্থক্য খুবই কম ছিল। মঞ্চীর প্রতি সুরাতিয়ার মনে মায়া ও মমতাও ছিল যথেষ্ট। সুরাতিয়া এমন এক চরিত্র যে জন্তুকে ভালবেসেছে শিশুর মতো। তাই যখন ভালুক নীলগাইয়ের বাচ্চা ধরতে এসেছে তখন সে বলেছে —

> “আমি একা বুকের মধ্যে ওকে জড়িয়ে নিয়ে শুই রাতে – ভালুকের পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মুখ হাত দিয়ে জোর করে চেপে আরও জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলুম।”[২৬]

শুধু তাই নয়, শিকারেও পটু ছিল সুরতিয়া মেয়েটি। অভিনব কৌশলে পোষা পাখি দিয়ে বুনো পাখিকে শিকার করতো অনায়াসেই। দরিদ্র হলেও পয়সার মূল্য অপরিসীম হয়ে ওঠেনি সুরাতিয়ার কাছে। তাই সহজেই কথক সত্যচরণের জন্য একটি গুড়গুড়ি উপহার হিসেবে কিনেছে সে। সে কারণে সত্যচরণও তাকে ভালবেসেছে অতি সহজেই। কথক সত্যচরণকে প্রথম পরিচয়েই অবাক করে দেয় মোটুকনাথ পাঁড়ে। সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শুধু সের খানেক ছাতু খেয়ে হেঁটে আসে সত্যচরণের কাছে। আজমাবাদ ও নাঢ়া বইহারের জনশূন্য প্রান্তরে কিছু রোজগারের আশায় সত্যচরণের কাছে এসেছে সে। তার অসহায় হৃদয় আবেদন সত্যচরণের মনকে স্পর্শ করে। সে একজন অতি সাধারণ সহজ সরল মানুষ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছাড়া আর কোনো কাজ সে করে না। সত্যচরণের উপর তার গভীর আস্থা। সত্যচরণকে সে 'টোল' খুলে দেওয়ার জন্য আবেদন জানায়। অবশেষে টোল খোলা হয়। মিছি নদীর উত্তরপাড়ে জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে সার্ভের উদ্দেশ্যে সত্যচরণ যে সময় তাবু ফেলে বাস করছেন সেই সময়ে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ। সত্যচরণকে সে 'বাবুজি' বলে নিজের পরিচয় দেয়। তার বাড়ি পাটনার বিহারশরীফ। লোকটির আত্মসম্মানবোধের সঙ্গে মিশে আছে তার শিক্ষিত সত্তা। তার মুখের ভাষা ভদ্র ও পরিমার্জিত হিন্দি। সে যেখানে মাইল তিনে হেঁটে এসেছে সত্যচরণকে শুধু মাত্র কবিতা শোনানোর জন্য এবং বেঙ্কটেশ্বরের মনে হয়েছে সত্যচরণ বাঙালি, তাই বাঙালিরা বিদ্যার বড় কদর জানে। তারা বিদ্বান হয়। কিন্তু সাধারণ গ্রাম্য মানুষ তাকে পাগল ভাবে। বেঙ্কটেশ্বরের স্ত্রীর নাম রুকমা। সত্যচরণ মনে মনে ভাবে —

> "গভীর প্রেম গভীর বেদনার মতো। বেঙ্কটেশ্বরের হৃদয় সেই সত্যের পানেই ইঙ্গিত করে।"[২৭]

রাজু পাঁড়ে 'আরণ্যক' উপন্যাসের এক উজ্জ্বলতম চরিত্র। তার দৈহিক গঠন দেখে সত্যচরণের মনে হয়েছে সে বয়সে বৃদ্ধও নয়, আবার তরুণও নয়। প্রচন্ড আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এই মানুষটি নিজের দুঃখের কষ্টের কথা অন্যকে বিশেষভাবে বলতে পারে না। ধরমপুর থেকে জমির উমেদারীতে আসা দু'বিঘা জমি রাজুকে লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দেন সত্যচরণ। তার প্রথম দু-বছর খাজনা দিতে হবে না, তৃতীয় বছর বিঘা পিছু চার আনা দিলেই হবে। কিন্তু জমিচাষে রাজুর মন বসে না। সে খুবই অলস প্রকৃতির। তাই তার জীবনে অভাব অনটন সর্বদাই লেগে থাকে। দিন যাপনের গ্লানি, এতটুকুও প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে তাকে দূরে সরে যেতে দেয়নি রাজু নিজের শিল্পী সত্তার অবসান ঘটাতে পারেনি। তাই সত্যিকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ হিসেবে রাজু পাঁড়েকে চিনতে ভুল হয়নি সত্যচরণের। রাজু খানিক চিকিৎসাবিদ্যাও জানতো। তবে যেবার শুয়োরমারির বস্তিতে কলেরা মহামারীর রূপ নেয় সেখানে রাজু অকুতোভয়ে রোগীদের চিকিৎসা করে। এই নিঃস্বার্থ পরহিতকারী মন তাকে উৎসাহিত করেছে এদের সেবায়। রাজুর জীবনেও প্রেম এসেছিল। কিন্তু প্রথম প্রেমের স্মৃতি আজও অমলিন হয়ে বেঁচে আছে বাহান্ন বছরের রাজুর হৃদয়ে। সেই মেয়েটি যে রাজুকে সাহস যুগিয়ে ছিল বাপকে সমস্ত কথা খুলে বলতে। গভীর ভালোবাসা মানুষকে চিরদিন সাহস যোগায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের মতো শক্তিশালী লেখকই তা প্রমাণ করেছেন। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন —

> "ওখানে ইহার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্যে মন মুগ্ধ হইল। দুইটি নরনারী কি করিয়া পরস্পরকে লাভ করিয়াছিল তাহাদের জীবনে, এই ইতিহাস যে কতখানি রহস্যময়, তাহা বুঝিয়াছিলাম সেদিন।"[২৮]

ধাতুরিয়া চরিত্রটি বিভূতিভূষণের অনন্য সৃষ্টি। সত্যচরণের সঙ্গে তার দেখা হয় রাসবিহারীর সিংহের বাড়িতে। ধাতুরিয়া এক কিশোর নর্তক। জানা গেছে সে হো-হো নাচ আর ছক্কারবাজী নৃত্য দেখাবে। এই দলে ধাতুরিয়াও আছে। তবে এই নাচ সভ্য জগতের মানুষজনের জন্য অপাঙক্তেয় হলেও বোদ্ধা সত্যচরণ মন দিয়ে অনুভব করেন —

> "এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্যজগৎ হইতে বহু দূরে অবস্থিত নিভৃত বণ্য আবেষ্টনীর মধ্যে এই দিগন্ত পরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এই নাচ-গান ই চমৎকার খাপ খায়।"[২৯]

এই অনাথ ছেলেটি চিনা ঘাসের দানা সিদ্ধ খেয়েই অপূর্ব স্বাস্থ্য এবং লাবণ্যভরা মুখে কি পরিতৃপ্তির হাসিই না হাসে। তার সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতে সত্যচরণের মনে হয় —

> "সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, এই বয়সে নাচিয়া গাইয়া পরের মন যোগাইয়া পয়সা রোজগার করিতে হয়। তাও রাসবিহারী সিংহের মতো ধন গর্বিতের অরসিকের গৃহে।"[৩০]

বিভূতিভূষণের সৃষ্ট একটি খল চরিত্র রাসবিহারী সিং। তার দাপটে গরীব প্রজা থরথর করে কাঁপে। লাঠিয়াল, পুলিশ সমস্ত কিছুই তার দখলে। মানুষ খুন করাটা তার কাছে খুবই সাধারণ বিষয়। মুনেশ্বর সিং সত্যচরণকে রাসবিহারী সম্পর্কে বলেছে —

> “রাসবিহারী অতিভয়ানক মানুষ, কত খুন করেছে জীবনে, তার লেখা জোখা আছে হুজুর? ওর অসাধ্য কাজ নেই খুন ঘর জ্বালানি মিথ্যে মোকদ্দমা খাড়া করা, ও সবটাতেই মজবুত।”[৩১]

রাসবিহারী সত্যচরণকে হোলির নিমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু সত্যচরণ নিমন্ত্রণ স্বীকার করে না। তার কারণ সত্যচরণ সেও যে কাপুরুষ নয় তা দেখানোর জন্য। সংস্কৃতিবিহীন বর্বর হলেও রাসবিহারীর আছে ধনের গর্ব। ছোট্টু সিং রাসবিহারীর মতোই এক হৃদয়হীন পাষণ্ড রাজপুত। দুর্বল গঙ্গোতাদের নিয়ন্ত্রিত করে তার শক্ত লাঠির শাসন। সে সত্যচরণকে সতর্ক করেছিল যেন তিনি তার শক্তি বুঝে কোনো কাজেই তার বাধা না দেন। এই অরণ্য অঞ্চলের সবকিছুকেই সে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। নাঢ়া বইহারের দেড় হাজার বিঘা সাধারণ মানুষের জমি দখল করেছে কিছু লাঠিয়াল দিয়ে ছোট্টু সিং। প্রথম পরিচ্ছেদেই পাঠকের কাছে সাক্ষাৎ হয় অশিক্ষিত গনু মাহাতোর। এই অরণ্য অঞ্চলের লোকবিশ্বাস, সামাজিক ক্রিয়া, প্রাত্যহিক জীবন কাহিনি গণু মাহাতোর মুখ থেকে জানা যায়। এই অরণ্য অঞ্চলে গঙ্গোতা বলে গঙ্গার দিয়ারা বা চরে যারা চাষবাস এবং গরু মহিষ চরিয়ে সারা জীবনধারণ করে তারা সাধারণত মাহাতো পদবী ব্যবহার করে। গনুদের জীবন সম্পর্কে সত্যচরণ বুঝেছিলেন তাদের জীবনধারার গঠনটাই আলাদা। ভালো খাবার থেকে তারা বঞ্চিত, জীবনের সুখভোগ থেকে তারা শতযোজন দূরে। অথচ এ নিয়ে গণু মাহাতোর কোন নালিশ নেই। গিরিধারীলালের সঙ্গে প্রথম দেখাতেই সত্যচরণের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। সে বড় গরীব, জাতিতে মাহাতো। ব্রহ্মা মাহাতোর মেলায় মাশুল আদায়কারী এক কর্মচারী সে। চরম দারিদ্র্য একজন মানুষকে কতটা নিচে নামাতে পারে সে তারই উদাহরণ। চার আনা তার প্রতিদিনের পারিশ্রমিক। রোগকাতর গিরিধারী লাল সত্যচরণকে বলে —

> “...নাম হুজুর গিরিধারী লাল, বাড়ী তিনডাঙ্গা। পরক্ষণেই কেমন একটা অদ্ভুত সুরে মিনতি, প্রার্থনা এবং বিকারের রোগীর অসঙ্গত আবদারের সুর এই কয়টি মিলাইয়া একধরনের সুরে বলিল, — একটু জল খাব জল।”[৩২]

ঈশ্বর সৎ, ন্যায় মানুষকেই বেশি কষ্ট দেন। কিন্তু অবশেষে নেই পেয়েছিল গিরিধারী লাল। সত্যচরণ তাকে কিছু জমি দিয়ে লবটুলিয়ায় বসবাস করান। পাঁচ বিঘা জমি নিজেই পরিষ্কার করে সে। পরিশ্রম করে সে নিজের জীবন ধারণ করে। যে অরণ্য প্রান্তরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব চরিত্রদের আবিষ্কার করেছিলেন সেই অরণ্য শেষপর্যন্ত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাই পরিশেষে বলতে হয় আরণ্যক উপন্যাসে প্রকৃতি ও অরণ্যচারী মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করেছে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৪৫, দ্বাবিংশ মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১৩, পৃ. ৩

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫ ২০০৬, পৃ. ৫৫৯

৩. বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩-৬১৪

৪. চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ, বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৬শে আগস্ট ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫, পৃ. ৪৩৫

৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৪ চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ৭৪

৬. বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ২৬৮

৮. বাগচী, ড.শর্মিলা, বিভূতিভূষণের মর্মলোক এবং আরণ্যক, একুশশতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০, পৃ. ৪৪

৯. তদেব, পৃ. ৪৩

১০. তদেব, পৃ. ৪৪-৪৫

১১. তদেব, পৃ. ৪৫

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম পুনর্মমুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩

১৩. বাগচী, ড.শর্মিলা, বিভূতিভূষণের মর্মলোক এবং আরণ্যক, একুশশতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০, পৃ. ৪৬

১৪. তদেব, পৃ. ৪৮

১৫. তদেব, পৃ. ৪৭

১৬. তদেব, পৃ. ৬২

১৭. তদেব, পৃ. ৬২

১৮. তদেব, পৃ. ৬৩

১৯. তদেব, পৃ. ৬৯

২০. তদেব, পৃ. ৭৩

২১. তদেব, পৃ. ৮৮

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ২৭০

২৩. বাগচী, শর্মিলা, বিভূতিভূষণের, মর্মলোক এবং আরণ্য, একুশশতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০, পৃ. ৫৭

২৪. তদেব, পৃ. ৫৭

২৫. তদেব, পৃ. ৯৫

২৬. তদেব, পৃ. ৯৫

২৭. তদেব, পৃ. ৮৩

২৮. তদেব, পৃ. ৮১

২৯. তদেভ, পৃ. ৭২

৩০. তদেব, পৃ. ৭২

৩১. তদেব, পৃ. ৭৫

৩২. তদেব, পৃ. ৬৬